প্রথম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে বনফুলের আর্বিভাবের প্রেক্ষাপট

প্রথম অধ্যায়

"বাংলা সাহিত্যে বনফুলের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট"

যে-কোন দেশের, যে-কোন কালের সাহিত্যে পালাবদলের বা নতুন কোন জীবনাদর্শের সূচনা একদিনে বা নির্দিষ্ট কোন এক সময়ে ঘটে না; তার মাহেন্দ্রক্ষণ অনুধাবন করতে হয় সেই যুগচেতনা ও লেখকের জীবনচেতনার সমন্বয়ে। বাংলা গল্পের জগতে বনফুলের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট অনুধাবন করতে হলে সমসাময়িক যুগচেতনার প্রেক্ষিতে ব্যক্তি–বনফুলের মানস–ধর্মকে বুঝতে হবে। এই অধ্যায়ে বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশের ধারায় বনফুলের আবির্ভাবের সময় যে সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও মানসিক পরিবেশ–পরিস্থিতি বাংলা ছোটগল্পকে প্রভাবিত করেছিল, যুগপ্রবণতা ধরে তার আলোচনা করে বাংলা ছোটগল্প চর্চার ধারায় বনফুলের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

বনফুলের জন্ম (১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই) থেকে মৃত্যু (১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত— এই সুদীর্ঘ সাতটি দশক ধরে নানা রাজনৈতিক ঘটনা বাংলা তথা ভারত তথা বিশ্বকে নানাভাবে আলোড়িত করেছিল, যা তৎকালীন রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি, সামাজিক জীবন ও ব্যক্তি চরিত্রের মানসিক পরিস্থিতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, আর তার অনিবার্য প্রভাব সমসাময়িক সাহিত্যিকদের রচনায় নানাভাবে পড়েছিল। সেই কালের প্রভাবকে আত্মীকরণের ও প্রকাশের 'ধরন' অনুসারে সাহিত্যিকেরা বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর ও মানসপ্রবণতার প্রতিনিধিত্বে পরিচিত হয়েছিলেন। তাই সাহিত্যিকদের মানসপ্রবণতা বিচারে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিস্থিতি আলোচনা অনিবার্য হয়ে ওঠে। তবে তা সমাজচেতনাকে অনুধাবন করার জন্য, ইতিহাস রচনার জন্য নয়।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বাংলা তথা ভারতের সামাজিক জীবনধারা, বাঙালির মানসলোকে তথা ভাবলোকে নানা উত্থান–পতনময় ভাবসংঘাত সৃষ্টি করেছিল, যা মানুষের জীবনকে, জীবনভাবনাকে ওলোট–পালট করে দিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বাঙালির মর্মমূলকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল, তা হল– 'বঙ্গ–ভঙ্গ আন্দোলন' (১৯০৫–১৯১১)। ঊনবিংশ শতাব্দীর সহজ সরল স্বাভাবিক অখণ্ড জীবনবোধের ভাবনায় তা প্রথম কুঠারাঘাত করল। লর্ড কার্জন সেদিন যে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার কথা বলেছিলেন, সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপামর বাঙালি ঐকবদ্ধ হয়ে অখণ্ড জাতিরূপে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছিল। এই সিদ্ধান্তকে কোনভাবেই সেদিন বাঙালি মনে প্রাণে মেনে নিতে পারে নি। তার প্রতিবাদ স্বরূপ তারা 'স্বদেশী আন্দোলন' শুরু করেছিল–বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকেনি। দুর্মর স্বাদেশিকতা ও বাঙালিত্বের চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে সহিংস হয়ে পড়েছিল। এক কথায়, সমগ্র বাংলাদেশের আপামর মানুষের মনে 'এক নবভাবের প্লাবন' ডাক দিয়েছিল। কিন্তু সেই উজ্জীবিত প্রাণাবেগ স্তব্ধ হয়ে গেল, যখন বঙ্গ–ভঙ্গ রদ হল (ডিসেম্বর, ১৯১১)। দেশের তরুণ সমাজ যে এক নতুন ভাবাদর্শ ও কর্মের সম্ভাবনার দিকে চেয়েছিল, তার সমাধি ঘটল। এর ফলে দেশের যুবসমাজ

তীব্র হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হল। বাঙালি সমাজে প্রাণস্ফূর্তিতে যে ধারা বইতে শুরু করেছিল, তা ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকল। বাঙালি আবার তার চিরাচরিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে থাকল যেন। তারপর মানবজীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘনিয়ে এল ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সার্বিয়াকে আক্রমণের মধ্য দিয়ে—শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সারা বিশ্ব এক মারণ খেলায় মেতে ওঠে নিজের পেশীশক্তির ক্ষমতা দেখানোর জন্য। বাংলা তথা ভারত প্রত্যক্ষভাবে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও এর তীব্র আঁচ থেকে রক্ষা পায় নি। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধের লেলিহান শিখা বাংলার জনজীবনকেও বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়। এই দীর্ঘ চার বছরের বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশই কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। আর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সাধারণ মানুষের জীবনে এক তীব্র শ্বাসরোধকারী অবস্থার সৃষ্টি করেছিল— ব্যাপক ও তীব্র অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা, স্বার্থপরতা, কালোবাজারী, মজুতদারী, সনাতন প্রত্যয়গুলির অপমৃত্যু — এককথায়, মানসিক সংকটের প্রবল আবর্তে পড়ে মানুষ সেদিন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। এরই মধ্যে ১৯১৭-য় সমাজতান্ত্রিক রুশ বিপ্লব, ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের নিষ্ঠুর দমনমূলক কালাকানুন 'রাওলাট আইন' প্রয়োগ জনজীবনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। প্রচণ্ড হতাশায় ও আঘাতে জনজীবন তখন ফুঁসছিল। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের বিশাল সমাবেশে মাইকেল ও' ডায়ারের নেতৃত্বে নিরস্ত্র মানুষের ওপর নৃশংসভাবে গুলি চালানোয় অগণিত নিরীহ মানুষ তাতে প্রাণ হারায়। সারা ভারত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সে দৃশ্য দেখে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন। জাতির দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ ক্ষোভ ফেটে পড়ে চরম বোঝাপড়ার নেশায়। এদের নেতৃত্ব দিলেন গান্ধীজী। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১-লা আগষ্ট গান্ধীজীর 'অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন' -এর সূচনা। সমগ্র দেশব্যাপী জাতি-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু অহিংস আন্দোলন সেদিন বুভুক্ষু দেশপ্রেমিক মানুষদের চিত্তকে অস্থির করে তুলেছিল। ফলে, আন্দোলন ক্রমেই সহিংস রূপ নিতে থাকে— উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা পুলিশ ফাঁড়িতে ২২ জন পুলিশকর্মীকে আন্দোলনকারীরা পুড়িয়ে মারলে, গান্ধীজী অহিংস আন্দোলন সহিংস রূপ নেওয়ায় ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই আন্দোলন ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল, মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশগ্রহণ না করা। কারণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণি তখন জীবন ধারনের তাগিদে সংসার প্রতিপালনের উপায় অন্বেষণে বাধ্য হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্যবিত্তের আর্থিক সংকট, দারিদ্র ও বেকার সমস্যা, খাদ্য-সংকট, বস্ত্র-সংকট ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এর কারণ হল, মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনায় (১৯১৯) অর্থনৈতিক সংস্কারের নিয়মকানুন। এতে নানাভাবে প্রদেশগুলি থেকে যতবেশি সম্ভব অর্থ সংগ্রহের একটা প্রচেষ্টা ছিল। তাতে বাংলাদেশও রেহাই পায়নি। এরপর ১৯২৮-এ মানবেন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে সাম্যবাদী আন্দোলন, ১৯২৯-এ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৩০-এর ফেব্রুয়ারিতে কংগ্রেসের 'আইন-অমান্য

আন্দোলন', ১৯৩১-১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের বাংলার মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের প্রচার ও প্রসার, ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে 'ভারত শাসন আইন' প্রণয়ন ও প্রয়োগ এবং তার অব্যবহিত পরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, যা ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩-রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলেছিল। এই ৬ বছর ১দিনের যুদ্ধ সারা পৃথিবীর তথা ভারত তথা বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার ধরন ও মানসিক প্রকৃতিকে একেবারে পাল্টে দিয়েছিল। তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, চারিদিকে সন্দেহ, অবিশ্বাস, সংঘাত, মূল্যবোধর চরম অবক্ষয়, আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা, জীবন-জিজ্ঞাসা, আত্মসন্ধান মানুষকে এক নতুন জীবন সংগ্রামের পথে ঠেলে দিয়েছিল। এরই মধ্যে ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, ১৯৪৩-এর ভয়াবহ বন্যা, মন্বন্তর বাংলার চিত্রটিই পাল্টে দিয়েছিল। তারপর ১৯৪৬-এর আত্মঘাতী রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাঙালির হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল। তারপর এল বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা---১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট। এই স্বাধীনতা অনেক স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল প্রাণে। কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে যে উদ্বাস্তু সমস্যা ও জীবন-সংকট দেখা দিয়েছিল তাও কম বিচলিত করেনি বাংলার সমাজ জীবনকে। আত্ম-জিজ্ঞাসা আর আত্মবিশ্লেষণ এক নতুন মাত্রালাভ করে পঞ্চাশের দশকে। এরপর ষাটের দশকে (১৯৬৭ সালের মে মাসে) উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে নকশাল আন্দোলনের সূচনা এবং সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ক্ষমতা লাভ বাংলায় চরম অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল আর তার ছাপ পড়তে শুরু করেছিল সাহিত্যিকদের রচনায়। ড. বিজিত ঘোষ তাঁর "নির্বাচিত ছোটগল্প ঃ নতুন আলোকে" গ্রন্থে জানিয়েছেন, "১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় পরিপূর্ণ সন্ত্রাসের রাজত্ব চলে। রাষ্ট্র ও জাতির জীবনে তুমুল রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সত্তরের দশকে হিংস্রতার রাজনীতির আক্রমণ ঘটে বার বার। প্রতিক্রিয়াশীলদের সন্ত্রাস সৃষ্টি, '৭২ -এর 'ভৈরবতন্ত্র', 'জরুরি অবস্থা'-র তাণ্ডব---সবকিছুই লেখক-শিল্পীদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে।

সমগ্র দেশ তখন ক্ষুধা, ঘৃণা, প্রতিবাদ ও ক্রোধের আগুনে দাউ-দাউ করে জ্বলছে। বুলেট-বেয়নটে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পথে প্রান্তরে, অরণ্যে বন্দিশালায় অবিরাম রক্ত ঝরাচ্ছে। তখন সেই আতঙ্ক পাণ্ডুর সন্ত্রাসের অবস্থায় রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দর্শন অনুযায়ী সমাজ সচেতন লেখকগণ সাধ্যমতো চেষ্টা করে গেছেন প্রতিবাদ-প্রতিরোধের গল্প লিখতে।"

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সত্তরের দশক (অর্থাৎ বনফুলের জীবৎকাল পর্যন্ত) পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন লেখক-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, যদিও অনেক লেখক ছিলেন যাঁরা কোন বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না, বা বলতে পারি, একটি বিশেষ পত্রিকায় নয়, একাধিক পত্রিকায় তাঁরা লিখতেন। সে সময় এক একটি পত্রিকা এক একটি বিশেষ আদর্শ নিয়ে যাত্রাপথ তৈরী করেছিল। 'ভারতী' (১৮৮৭-১৯২৬), 'প্রবাসী' (১৯০১-১৯৬৬), 'ভারতবর্ষ' (১৯১৩-১৯৫৬), 'সবুজ পত্র' (১৯১৪-১৯২৮), 'কল্লোল' (১৯২৩-১৯৩০), 'শনিবারের চিঠি' (১৯২৪-

১৯৬৩), 'উত্তরা' (১৯২৫-১৯৬৩), 'কালি-কলম' (১৯২৬-১৯৩০), 'বিচিত্রা' (১৯২৭-১৯৩৯), 'প্রগতি' (১৯২৭-১৯৩০), 'পরিচয়' (১৯৩১ -), 'কবিতা' (১৯৩৫-১৯৬৫),'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮-), 'পূর্ব্বাশা' (১৯৩২-১৯৭৭), 'আত্মশক্তি', 'ধূপছায়া', 'সংহতি', 'দেশ', 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে সেদিন ও বহু সাহিত্যিক তাঁদের নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী অজস্র গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখে নব নব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন।

তবে আমরা আলোচনার প্রেক্ষাপটে উক্ত পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে যে বিশেষ লেখক গোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যাসরে আবির্ভূত হয়েছিলেন (বিশেষতঃ বনফুলের সমসাময়িক কালে) তাঁদের মানস প্রবণতা আলোচনা করে বনফুলের স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

বনফুলের সমসাময়িককালের উল্লেখযোগ্য গল্পকারদের মধ্যে যাঁদের আমি আলোচনার পরিসরে রেখেছি, তাঁরা হলেন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), দীনেশ রঞ্জন দাস (১৮৮৮-১৯৪১), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), গোকুল চন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫), মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭-১৯৮৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯), পরিমল গোস্বামী (১৮৯৯-১৯৭৬), সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭), মণীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯), অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), সরোজ কুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩-১৯৭২), শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০), প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), প্রবোধ কুমার সান্যাল (১৯০৭-১৯৮৩), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৬), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭০), নবেন্দু ঘোষ (১৯১৬-), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) প্রমুখ।

উক্ত সাহিত্যিকেরা কেউ কেউ মধ্যবিত্তের জীবনাশ্রয়ী ভাবালুতা, কেউ কেউ রিরংসার জীবন-কথা, কেউ কেউযৌনচেতনা নির্ভর জীবনকথা, কেউ কেউ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবেশ-পরিস্থিতি, কেউ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারী, মজুতদারী, মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সংকট, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতিকে নিয়ে গল্প লিখেছেন। কিন্তু যিনি বেশ কিছুটা নতুন স্বাদের, নতুন ধাঁচের গল্প লিখে চমক সৃষ্টি করলেন, তিনি হলেন বনফুল ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তবে বনফুলের স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের পূর্বে উক্ত সাহিত্যিকদের মানস প্রবণতাটি অনুধাবনের পথে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ঃ ছোটগল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথের প্রথম

গল্প রচনার প্রচেষ্টা দেখা যায় 'ভারতী' পত্রিকায় 'ভিখারিনী' (১২৮৪) গল্প রচনার মধ্যে। তবে তা সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠেছে কিনা তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধায় ছিলেন। এসম্পর্কে তিনি বলেছেন— **'সেটা যে কি বকুনির বিনুনি তা নিজে যাচাই করবার বয়স ছিল না।'** এরপর ১২৯১ বঙ্গাব্দে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় 'ঘাটের কথা' এবং 'নবজীবন' পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গাব্দে 'রাজপথের কথা' প্রকাশিত হয়। এরপর একে একে ১৮৯১-১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বহু গল্প লিখেছেন। যেমন— 'দেনাপাওনা' 'পোস্টমাষ্টার' 'গিন্নি' 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' 'ব্যবধান' 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' 'অতিথি' 'সুভা' 'ছুটি' 'আপদ' 'মাল্যদান' 'একরাত্রি' 'সমাপ্তি' 'নষ্টনীড়' 'মণিহারা' 'কঙ্কাল' 'ক্ষুধিত পাষাণ' 'গুপ্তধন' 'স্ত্রীর পত্র' 'তিনসঙ্গী'-র - 'রবিবার' 'শেষকথা' 'ল্যাবরেটরি'। রবীন্দ্রনাথের এই বিবিধ সৃষ্টি সম্ভারে বাংলা ছোটগল্পের পত্তন, পরিচর্যা ও বিকাশ। আমাদের জগৎ ও জীবনের নানা সমস্যা, অনুভূতি ও উপলব্ধি দিয়ে তিনি গল্প ফেঁদেছেন। তিনিই বাংলা ছোটগল্পে এক নব্য দৃষ্টিদানে পরবর্তীকালের আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের পথটি প্রশস্ত ও মসৃণ করেছেন। তাঁর ছোটগল্পে নারীর আত্মমর্যাদা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক সম্পর্কের নবমূল্যায়ণ, পুরনো মূল্যবোধকে নতুন আলোকে দেখা ইত্যাদি প্রসঙ্গ রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর নগরকেন্দ্রিক রেনেসাঁসের বোধকে ছাপিয়ে রবীন্দ্র ছোটগল্পে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে ধ্যান-ধারণার ভাঙাগড়া, লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, **'নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার ইতিহাস।'** এই নিজের সঙ্গে নিজের **'বোঝাপড়া'** করতে গিয়ে তাই সবসময়ই তাঁর গল্পে একটি আদর্শবোধ বা **'আইডিয়ালিজম'** পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে, যাতে করে আমাদের মনে হয় তাঁর গল্পগুলিতে বাস্তবতার স্পর্শ থাকলেও মাটির স্পর্শে মলিন হয়নি পুরোপুরি। বিংশ শতাব্দীর দু'টি বিশ্বসমর যেখানে আমাদের সমাজ জীবনের মর্মমূলকে ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল, সেই মহাযুদ্ধের বিভীষিকা ও মানবীয় মূল্যবোধের ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে 'সভ্যতার-সংকট' -এ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, **"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।"**[১] তাঁর এই **'সুদৃঢ় মানব প্রত্যয় ও শাশ্বত জীবনসত্যে'** আস্থা তাঁকে আদর্শবাদের দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে বলে মনে হয়। তবু একথা বলতে কুণ্ঠা নেই যে, তাঁর প্রদর্শিত পথেই বাংলা ছোটগল্পের পথচলা শুরু।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) ঃ 'ভারতী' গোষ্ঠীর প্রভাতকুমার রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে লালিত এক যোগ্য উত্তরসূরী। **'উত্তরসূরী'** এই অর্থে যে তিনি রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে গল্প লিখে আপন বৈশিষ্ট্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করে বাংলা ছোটগল্পের ধারাকে সমৃদ্ধ করলেও রবীন্দ্র ভাব পরিমণ্ডল থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেন নি। প্রভাত কুমারের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল— 'বলবান জামাতা' 'কাশী বাসিনী' 'আদরিণী' 'প্রণয় পরিণাম' 'রসময়ীর রসিকতা' 'দেবী' 'মাষ্টার মশায়' 'বউচুরি' 'লেডি ডাক্তার' 'ফুলের মূল্য' 'মাতৃহীন' ইত্যাদি। তাঁর গল্পগুলি কোনটি নির্মল হাস্যরসের, কোনটি মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজ সমস্যামূলক, কোনটি অলৌকিক, কোনটি বা বিদেশী পটভূমিকায় রচিত। প্রভাতকুমারের গল্পগুলিতে একটি **'মোহের আবরণ'** প্রভাব বিস্তার

করেছিল। তাতে চমকে দেবার মত কোন ফ্যাক্টর কাজ করে নি। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন— **"প্রভাতকুমার যে একেবারে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের গল্প উপহার দিতে পারেন নি, তা তাঁর ত্রুটি নয়, ব্যক্তিত্বের সীমা। এই সীমা কিন্তু এক খড়ির গণ্ডি, যার মধ্যে তিনি প্রধান অর্থে 'good' বা 'minor' গল্পকার। এই ক্ষমতায় বেশ কয়েকটি ভাল গল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। পাঠকের মনকে বিলাসের, তৃপ্তির সুখপাঠ্য স্বভাবে মজিয়ে তোলার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল। লঘুরস আর সাজানো সমাজের ছবি ধরে তিনি নিপুণ কুশলী গল্প শুনিয়েছেন। মানুষে মানুষে স্নেহের সম্পর্ক, কৌতুকহাস্যের শুভ ও শোভনশালীন রসস্রোত, ঘটনা সাজানোর কৌশল, বিলাস-মুখ্য পরিবেশ রচনা, আপনজনদের মধ্যেকার সহজ পদস্খলনে শান্তি বারি বর্ষণ—এসব নিয়েই গল্পের শিল্পগত সর্বায়ব বন্ধনকে মোহের আবরণে সত্য করেছেন।"**[২] তাই এই 'শুচিবাদী লেখকের' 'ঘটনা সাজানোর স্বাভাবিক কৌশল, পাঠক রুচির ও চিত্তবিনোদনের আনুগত্য— সহজ আনন্দ সুখ দানের লক্ষ্য, এসবেই তাঁর সে সময়ের বিপুল জনপ্রিয়তার শিল্প-ভাগ্য নির্দিষ্ট কবচকুণ্ডল।'[৩] তবু বলা যায় প্রভাতকুমারের গল্পগুলি সে সময়ের বাংলা সাহিত্যে এক নতুন স্বাদ দিয়েছিল, বিশেষতঃ তাঁর হাসির গল্পগুলি। তাঁর গল্পের প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— **"তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।"** গল্পের এই কল্পনাবিলাসিতা ও হাস্যরসোচ্ছলতার মধ্যেও জীবনের অনেক গভীর সত্য রূপায়িত করেছেন প্রভাতকুমার। তবে তাতে সমকালীন যুগ-যন্ত্রণার প্রভাব কম, জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে চলমান কিছু ছবি উঠে এসেছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)ঃ 'ভারতী' পর্বের আর এক উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম গল্প 'মন্দির' ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল এবং তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বড়দিদি' ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যাসরে পদার্পণের সময়টি যুগসন্ধিক্ষণের। একদিকে সাহিত্যে গণতান্ত্রিক চেতনার ধারা অর্থাৎ অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের কথা; অন্যদিকে পুরনো রক্ষণশীল সমাজের ও পরিবারের মানুষের হৃদয়বত্তা ও মনুষ্যত্বের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ লাভ করেছে। নারীর নব মূল্যায়ণ, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ, মানুষের হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রেম-ভালোবাসা-দলাদলি-গালাগালি যে সহানুভূতি রসে শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে তার বিকল্প নেই। শরৎচন্দ্রের জীবন চিত্রণে যে দরদ ও ভাবাবেগের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় বিংশ শতাব্দীর সংকটকালীন সময়ে সেই হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য থেকে সাহিত্য সরে আসতে শুরু করেছিল। তবু তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়ে সেদিন আপামর বাঙালি তৃপ্তি পেয়েছিল। এর কারণ, **"তিনি বাংলাদেশের নিতান্ত পাঁচাপাঁচি সাধারণ নর-নারীর মলিন ও তুচ্ছ জীবনকেই উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাতে**

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কল্পলোকচারী প্রেম ও রোমান্সের বিপুল ঐশ্বর্য নেই বললেই চলে।"[৪] তাঁর 'অভাগীর স্বর্গ' 'গিন্নি' 'পল্লীসমাজ' 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসগুলি পড়লে এ সত্যতা টের পাওয়া যায়।

চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) ঃ 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'মনের কথা' চারুচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প। 'প্রবাসী'-র সহ-সম্পাদক হিসেবে তিনি কাজও করেছেন কিছুদিন। 'ভারতী'-তেও লিখেছেন চারুচন্দ্র। 'অপরাজিতা' 'প্রেমের নিরিখ' 'চুড়িওয়ালা' 'বন্ধু' 'বায়ু বহে পূরবৈয়া' প্রভৃতি চারুচন্দ্রের বিশিষ্ট গল্প। তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে যৌন আবিলতা, রোমান্টিক ভাবালুতা ও 'কাব্যগন্ধিতা' বেশি প্রকট।

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) ঃ বাংলা সাহিত্যে নির্মল হাস্যরসের গল্প যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর আত্মপ্রকাশ গল্পের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। ১৩২৯ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'বিরিঞ্চি বাবা' নামে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। চেষ্টাকৃত নয়, আমাদের চিরপরিচিত সাধারণ নর-নারীর চরিত্রের অসঙ্গতিতে সহজ-সরলভাবে সামান্য অতিরঞ্জনের দ্বারাই এক অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তিনি। পরশুরামের প্রথম গল্প সংকলন 'গড্ডালিকা' প্রকাশিত হবার পরই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' 'চিকিৎসা সংকট' 'ভূশণ্ডীর মাঠে' 'লম্বকর্ণ' ইত্যাদি গল্পগুলি 'সৃজন কৌশল বস্তু-বিশ্বের নিখুঁত অভিজ্ঞতার সঙ্গে লেখকের মননশীল মনের 'fantasy'-র বিমিশ্রতায় গড়া'[৫] এক উদ্ভট পরিবেশ আমাদের এক অনাবিল হাসির জগতে নিয়ে যায়। তবে বিংশ শতাব্দীর মানব-জীবনের জটিল জীবন-সংকটের চিত্র তাতে অনুপস্থিত।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) ঃ বাংলা কথা সাহিত্যে রবীন্দ্র উত্তরণের সচেতন প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের গল্প-উপন্যাসে। সাহিত্যে 'বাস্তবতা' অর্থাৎ নর-নারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে 'ভারতী' গোষ্ঠীর রচনায় ইতিপূর্বেই রূপলাভ করেছে আংশিক ভাবে। তাতে নতুন সুর যোজনা করলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। তাঁর প্রথম গল্প 'ঠানদিদি' ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর 'পাপের ছাপ' ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি "যৌনভাবাশ্রিত ক্রিমিনাল মনোবৃত্তির"[৬] প্রথম রূপচিত্রণ। তাঁর 'ঠানদিদি' গল্পে 'যৌন অভিলাসের অসংলগ্ন আত্যন্তিকতার প্রতি-ই প্রধান ঝোঁক।'[৭] তাঁর ছোটগল্প সংকলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — 'দ্বিতীয় পক্ষ' (১৯১৯), 'অগ্নি সংস্কার' (১৯২০), 'গ্রামের কথা' (১৯২৪), 'একা' (১৯২৭), 'তাবিজ' (১৯২৯) প্রভৃতি। তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস 'স্বপ্ন সৌধ' (১৯৬১)। নরেশচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে মানব-জীবন ও সমাজ জীবনের যে চিত্র রূপায়িত হয়েছে তাতে বস্তুতঃ 'বৈনাশিকতার মনস্তত্ব তত নয়, নর-নারীর দেহাসঙ্গের নানা 'আধুনিক' জটিলতার চারপাশে সমকালচলিত সামাজিক সমস্যার দীর্ঘ বিস্তৃত জাল বুনেই এগিয়েছে তাঁর গল্প-উপন্যাস।'[৮]

জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) ঃ জগদীশ গুপ্তের গল্পে প্রকৃতিকতাই অর্থাৎ ন্যাচারালিজম রূপলাভ করেছে। তাঁর প্রথম গল্প 'পেয়িং গেষ্ট' 'বিজলী' পত্রিকায় ২৯-শে ফাল্গুন ১৩৩১-এর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল' ও 'কালি কলমে' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প সংখ্যা ছিল দু'টি— 'ঘেন্নার কথা' ও 'পুরাতন ভৃত্য'। তিনি বহু গল্প রচনা করেছেন। তাঁর **'জগদীশ গুপ্ত মানবজীবনের শুভ পরিণামে আস্থা স্থাপন করেন নি। মানুষের জীবনব্যাপী সকল শুভ প্রয়াসে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায় তাঁর বিশ্বাস। আর এই ব্যর্থতার অন্তরালে তিনি অনুভব করেছেন এক অন্ধ নির্মম শক্তিকে। তার কাছে মানুষ পরাজিত। ব্যক্তির এই অসহায়তা জগদীশ গুপ্তের গল্পপাঠে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়ে যায়।'**[৯] জগদীশ চন্দ্রের গল্পে এই দুঃখময়তার চিত্র অঙ্কনে যৌন অভিব্যক্তি বড় প্রকট সেটাও অবশ্য স্বীকার্য। 'কল্লোল'-এর কালের উদ্দাম যৌন বিলাস তাঁর রচনাতেও উপস্থিত। তাঁর গল্প সংকলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'বিনোদিনী' (১৯২৭), 'রূপের বাহিরে' (১৯২৯), 'শ্রীমতি' (১৯৩০), 'উদয় লেখা' (১৯৩২), 'তৃষিত' (১৯৩২), 'সৃক্কনি' (১৯৩২), 'রতি ও বিরতি' (১৯৩৪), 'উপায়ণ' (১৯৩৪), 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' (১৯৩৫), 'মেঘাবৃত্ত অশনি' (১৯৪৭) প্রভৃতি।

দীনেশ রঞ্জন দাস (১৮৮৮-১৯৪১) ঃ 'কল্লোল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক ও 'four arts club'-এর সদস্য দীনেশ রঞ্জন দাসের গল্পে তৎকালীন জীবন যন্ত্রণার চিত্র ও যুগ পরিবর্তনের নানা ছবি ফুটে উঠেছে। তাঁর রোমান্টিক স্বপ্নপ্রবণ মন নর-নারীর জীবন চিত্রনে স্বপ্নমেদুরতা আমদানি করেছে। 'পার্বতী' 'গাঁয়ের মাটি' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'মাটির নেশা', 'ভূঁইচাপা' নামে তাঁর দু'টি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়। তিনি ছিলেন কল্লোলীয় চেতনার ধারক ও বাহক এবং সর্বোপরি 'কল্লোল গোষ্ঠী'র জনক। তিনি ছিলেন **'কল্লোলের সব পেয়েছিল দেশ। সব হারানোর মধ্যমণি।'**[১০]

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯৮৭) ঃ দেশ কাল 'হিসেব ছুট' লেখক বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম গল্প 'অবিচার' প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'-তে ১৩২২-এর শ্রাবণ সংখ্যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলনগুলি হল— 'রাণুর প্রথম ভাগ' (১৯৩৭) 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' (১৯৩৮) 'রাণুর তৃতীয় ভাগ' (১৯৪০) 'বর্ষায়' (১৯৪০), 'রাণুর কথামালা' (১৯৪১) 'বসন্তে' (১৯৪১) 'বরযাত্রী' (১৯৪২) 'বাস্তব ও অবাস্তব' (১৯৫৪) 'কন্যা সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী' (১৯৬২) প্রভৃতি। বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে সমকালীন জীবনের জটিল রূপায়ণ নেই, সহজ সরল হাস্যোজ্জ্বল জীবন চিত্রই ফুটে উঠেছে। হাসির গল্পকাররূপে তাঁর পরিচিতি সমধিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কোন উত্তেজনা বা সচেতনতা তাঁর গল্পে নেই বললেই চলে। তাঁর **'কাহিনীতে বর্ণিত জীবনের সুনির্দিষ্ট কোন কাল চরিত্র গড়ে ওঠেনি।'**[১১]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) ঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' ১৩২৮ বঙ্গাব্দের (১৯২১) মাঘ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২৯ বছর ধরে

বিভূতিভূষণ গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্প গ্রন্থের সংখ্যা ২৯ এবং প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা ২২৪। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'মেঘমল্লার' 'মৌরীফুল' 'যাত্রাবদল' 'কিন্নরদল' 'তালনবমী' ইত্যাদি। বিভূতিভূষণের গল্পের প্রধান আকর্ষণ মানুষ। তিনি জীবনপ্রেমী শিল্পী। জীবনের সহজ সরল সাধারণ রূপ অঙ্কনেই তাঁর ঝোঁক প্রবল। তাঁর রচনার বিশেষ আকর্ষণ হল **'মন কেমনের হাওয়া (nostalgia)**।'[১২] তিনি শরৎচন্দ্রের ঘরোয়া রোমান্সকে আরও ঘোরালো ভাবে রূপায়িত করেছেন।

গোকুল চন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) ঃ চারুশিল্প, গান, সাহিত্য এবং কারুশিল্প সমন্বিত **'four arts club'** -এর অন্যতম স্থপতি ও কল্লোলীয় চেতনার পরিবাহক গোকুল চন্দ্র নাগ 'কল্লোল' (১৯২২) পত্রিকা বের করে এক নতুন 'আধুনিকতা' আমদানি করেছিলেন সাহিত্যে। 'কল্লোল' ছাড়াও 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' 'নবভারত' পত্রিকাতেও তাঁর কিছু গল্প বের হয়। 'রূপরেখা' (১৯২৪) 'মায়ামুকুল' (১৯২৭) তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন। 'দেবতার গ্রাস' তাঁর একটি বিশিষ্ট গল্প। তৎকালীন জীবনের আরক্ত কামনা-বাসনা, অতৃপ্ত বেদনা, উদ্মাদনা, উচ্ছলতা তাঁর গল্পগুলিতে নিটোলভাবে রূপায়িত হয়েছে। যদিও সেসব গল্পে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে।

মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭-১৯৮৬) ঃ 'কল্লোল' ধারার 'যথার্থ উত্তরসূরী' মণীন্দ্রলাল বসু বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক উচ্ছ্বাস ও প্রকৃতিকতা এবং সমাজের বিরুদ্ধে এক তির্যক বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে গল্প-উপন্যাস রচনা শুরু করেন। 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হবার পূর্বেই 'প্রবাসী' তে তাঁর বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস বের হয়, যাতে কল্লোলীয় মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। কল্লোলের পূর্বে যে **'four arts club'** গোকুল নাগ ও দীনেশ রঞ্জন দাস গড়েছিলেন, তার সদস্য ছিলেন তিনি। অবক্ষয়ী যুগের চেতনা যুব সমাজকে যখন উদ্বেলিত করে তুলেছিল, সেই সর্বাত্মক ধ্বংসের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে তিনি **'নর-নারীর দেহমনগত সম্পর্ক নিয়ে নূতন কৌতুহল, নূতন জটিলতা, মধ্যবিত্ত অবনমনের চালচিত্র, ক্ষয়িষ্ণু তারুণ্যের ঝলসে পড়া ভাবোদ্দীপনা ও তার করুণতা'**[১৩]— সমস্ত কিছুই তাঁর রচনায় প্রতিভাত হয়েছে, তবুও সেই জীবন চিত্রণে এক রোমান্টিক স্বপ্নাতুর অনুভূতি জড়িয়ে আছে। 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত তাঁর 'মা' গল্পটি সে সময় অনেকের হৃদয়ে দাগ কেটেছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলনগুলি হল— 'মায়াপুরী' (১৯৩০) 'রক্তকমল' (১৯২৪) 'সোনার হরিণ' (১৯২৪) 'কল্পলতা' (১৯৩৫) 'ঋতুপর্ণ' (১৯৩৭) ইত্যাদি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মাটি ও মানুষের শিল্পী, প্রবৃত্তি ও নিয়তি লীলার রূপকার। সেই সঙ্গে যে জীবন জীবদেহকে অতিক্রম করে মানবধর্মকে খুঁজে পায় তারও শিল্পী। তবে আঞ্চলিক সাহিত্যের স্রষ্টা হিসেবেই তাঁরও সমধিক পরিচিতি। উত্তর রাঢ়ের অর্থাৎ বীরভূম-বাঁকুড়ার অন্তে নিবাসী সমাজ ও জীবন কথাই তাঁর সাহিত্যে প্রধানভাবে রূপ গ্রহণ করেছে। **'এই সমাজের অভিজাত, অনভিজাত, জমিদার লোভী ব্রাহ্মণ, ডাক্তার, কেরানী, ব্যবসায়ী, কাহার, বাগ্দী, সাঁওতাল, চাষী, মাঝি, বাজীকর, বেদেনী খেমটা**

নাচের দল সবই আছে।'[১৪] সেই সঙ্গে আছে সমসাময়িক নানা রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনও সংঘর্ষের ছবি। তাঁর গল্প-উপন্যাসে পুরাতন ও নতুন কালের দ্বন্দ্ব একটি বিশেষ মাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' 'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩৫ (১৯২৮) ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়। তারপরের গল্প 'হারানো সুর'-ও 'কল্লোল'-এ ১৩৩৫ সালের বৈশাখ (১৯২৮) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল' -এ যাত্রা শুরু করলেও পরে তা থেকে বেরিয়ে আসেন তারাশঙ্কর।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) ঃ উকিল শরদিন্দুও বনফুলের সমসাময়িক একজন বিশিষ্ট লেখক। দু'জনেরই জীবৎকাল সমান। গোয়েন্দা বাহিনীর যাদুকর শরদিন্দু মুখ্যত গোয়েন্দা কাহিনী ও ঐতিহাসিক কাহিনীর রূপকার হিসেবেই পরিচিত। তবে কিছু হাস্যরসাত্মক গল্পও তিনি উপহার দিয়েছেন। ছোটগল্পে যে তির্যকতা, ব্যঞ্জনাধর্মীতা, অতৃপ্তিবোধ জন্মে, যে ধরনের গল্প তিনি লেখেননি। তাঁর গল্পের শেষে স্বাভাবিকভাবেই একটা পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। 'রক্তসন্ধ্যা' শরদিন্দুর প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গল্প। গল্পটি ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (১৯২৩) প্রকাশিত হয়। তাঁর গল্প সংকলনগুলির মধ্যে আছে— 'ব্যুমেরাং' (১৯৩৮), 'বিষকন্যা' (১৯৪০), 'দন্তরুচি' (১৯৪৫) 'কাঁচামিঠে' (১৯৪২) 'কালকূট' (১৯৪৪), 'পঞ্চভূত' (১৯৪৫) প্রভৃতি। তাঁর প্রথম গল্প 'রক্তসন্ধ্যা' প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘর্ষের রূপচিত্রণ, তবে তা রোমান্সের মোড়কে আবৃত। 'কানু কহে রাই' (১৯৫৫) গল্প সংগ্রহে ইতিহাস নয়, বাঙালির ঘরের ঘরোয়া কাহিনী, যা রোমান্সের ঠাস-বুনোট। 'মায়াকুরঙ্গী' (১৯৫৮) গল্প সংগ্রহ ভৌতিক গল্পের পসরা। অতএব ভিন্ন আবেদনের, ভিন্ন স্বাদের বেশ কিছু গল্প তিনি রচনা করেছেন। তবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মত তাঁর পাত্র-পাত্রীরাও দেশ-কাল নিরপেক্ষ। কিন্তু মেজাজের দিক থেকে শরদিন্দু বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের চেয়ে অমিশ্র ও একাগ্র।

পরিমল গোস্বামী (১৮৯৯-১৯৭৬) ঃ পরিমল গোস্বামী বনফুলের সমসাময়িক এক বিশিষ্ট লেখক ও বনফুলের সুহৃদ বন্ধু। 'শনিবারের চিঠির' সম্পাদনা সূত্রে তাঁর সাহিত্যে মনোনিবেশ। তাঁর গল্প সরস-কৌতুক চিত্র নির্ভর। তাঁর 'শনিবারের চিঠি' আক্রমণ উত্তেজনা তাঁর শান্ত-স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব ও রচনা কর্মে প্রভাব ফেলেনি। পরিমলবাবুর রচনায় সমকালীন প্রসঙ্গ উঠে এসেছে বারবার। **"তাঁর হাসির গল্পে 'শনিবারের চিঠি'- ধর্মী ঝাঁজালো বিদ্রুপ-প্রবণতা অনুপস্থিত। সমকালীন জীবনের ছোট বড়ো অসংগতি ধরে ছোটো এবং বড়ো আকারের বিবৃতি ছড়ানোর গল্প লিখেছেন পরিমল গোস্বামী নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে। হঠাৎই তার ভেতর হতে দোলা দিয়ে কৌতুকের হিল্লোল উপচে ওঠে। বিক্ষুব্ধ বিদ্রুপের উত্তাপের চেলে তাঁর হাসির গল্পে তীক্ষ্ণ কটাক্ষের স্মিত সৌরভ অনুভবনীয় খুশির আমেজ নিয়ে ঘোরে ফেরে।"**[১৫] মানুষের চরিত্রের অসঙ্গতিকে 'একটু বাড়িয়ে' তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। তবে সে হাসি সংযত, স্মিত ও বুদ্ধিচকিত। তাঁর গল্প-সংকলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'বুদ্বুদ' (১৯৩৬) 'ট্রামের সেই লোকটি' (১৯৪৪) 'ব্ল্যাক মার্কেট' (১৯৪৫) 'ম্যাজিক লণ্ঠন' (১৯৫৫) ইত্যাদি।

সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) ঃ ব্যঙ্গ ও গভীর রসের গল্পকার সজনীকান্ত দাস

'শনিবারের চিঠি'-র একক প্রতিনিধি। 'কলিকাল' (১৯৪০) তাঁর ব্যঙ্গরসের গল্প সংকলণ, আর 'আকাশ বাসর' (১৯৪৪) তাঁর গভীর রসের বিশিষ্ট গল্প সংকলন। সজনীকান্ত দাস প্যারডি জাতীয় রচনার সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। **'সজনীকান্তের পক্ষপুটাশ্রিত দ্বিতীয় বড়ো লেখক ছিলেন বনফুল।'**[১৬]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) ঃ শৈলজানন্দের বাস্তবতাবোধ নিবিড় ও গভীর; কারণ, দেশের মাটি ও জনজীবনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ। আদিম নর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নর-নারীর ভালোবাসা ও যৌনাকর্ষণের তীব্র জটিল রহস্যের নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে তাঁর গল্পে। শরৎচন্দ্রের বাস্তব গ্রাম্য জীবন চিত্রণে আছে দরদ ও ভাবাবেগের প্রাচুর্য, শৈলজানন্দের আছে নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি— যা কখনো কখনো নির্মম বলে মনে হয়। **"আমাদের দেশের সমাজের ও সংস্কারের যে সব দৃশ্য রমণীয় নয়, হৃদ্য নয়, যার কোন তাৎপর্য নেই, সুতরাং যা সাহিত্যের পটে ওঠেনি তাই তিনি আঁকতে লাগলেন নির্বিকার মধ্যস্থ অথচ সরল চিত্তে। রবীন্দ্রনাথ সর্ববিধ বাঙালি মানুষকে সর্ব প্রথম ঠাঁই দিয়েছিলেন সাহিত্যের সভায়। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সর্বত্রগামী হয়নি। তিনি কয়লাকুঠীর সাঁওতাল নর-নারীর পরিচয় পান নি। বাঙালীর উচ্চ ও নিম্নবিত্ত ভদ্র সংসারের কলকাতায় মেস-বাসী পড়ুয়া ছাত্রের চাকুরে যুবকের ছবি এঁকে গেছেন কিন্তু নোংরা পাড়ায় জীর্ণ ভাঙা বাড়িতে ও বস্তিতে হতচ্ছাড়া ভবঘুরে বাঙালী সন্তানের হদিশ দেন নি। রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের ত্রুটি সংশোধিত হল শৈলজানন্দের রচনায়। শৈলজানন্দের লেখায় কোন ধর্ম বা রাষ্ট্রঘটিত মতামতের দিকে কোনই ঝোঁক নেই। তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ ও sex রক্তরাগ বিহীন এবং সেই হেতু প্রায়ই অরমনীয় এবং অনেক সময় নিষ্ঠুর। বলতে পারি শৈলজানন্দের সাহিত্য সৃষ্টি মানুষের বিচিত্র জীবন চেষ্টাকে নিরপেক্ষ বাস্তবভাবে দেখেছে। স্ন্যাপশট প্রধান রচনা হওয়ায় শৈলজানন্দের রচনা সবই হয় ছোট, নয় বড়ো গল্প।"**[১৭] কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলজানন্দের মধ্যে কয়লাকুঠির বাস্তবতার চাইতে **'মধ্যবিত্তের রোমান্টিক ভাবাবেগ'**-কে খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর কথায়— **"শৈলজানন্দের গ্রাম্য জীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ— কিন্তু শুধু ছবি-ই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আসে নি। বস্তি জীবন এসেছে কিন্তু বস্তি জীবনের বাস্তবতা আসে নি-বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্য বিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসে নি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম বাতিল হয় নি, এই একই রোমান্স শুধু দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।"**[১৮] শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠির গল্প' 'নারীমেধ' 'পোড়ারমুখী' 'বধূবরণ' 'নারীর মন' 'নিরাশ্রয়' 'সত্য-মিথ্যা' 'জীবন সঙ্গিনী' প্রভৃতি গল্পে সেই জীবন চিত্র প্রতিভাত।

মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭) ঃ মনোজ বসু মনোধর্মে ছিলেন রোমান্টিক। 'কল্লোল-এর

লেখক না হলেও কল্লোলের মনোভঙ্গিমার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের (১৯৩০) কার্তিক সংখ্যায় তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। নাম— 'পিছনের হাতছানি', যা পরবর্তীকালে 'নতুন ফসল' নামে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পায়। মন মানসিকতায় মনোজ বসু তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছাকাছি হলেও, প্রকাশ রীতিতে স্বতন্ত্র। প্রকৃতির মধ্যে এক রোমান্টিক নিবিড় আবেগ সঞ্চারিত করে তাকে মানব জীবনের সঙ্গে একীভূত করে গভীর ব্যঞ্জনা দান করেছেন তিনি। 'বাঘ' 'বন মর্মর' 'নর বাঁধ' গল্পে মনোজ বসুর সেই রোমান্টিক স্বপ্নাতুর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও মনোজ বসু রাজনৈতিক ('সীমান্ত' 'ঘরে আগুন') অলৌকিক ('প্রেতিনী' 'ছায়াময়ী') প্রভৃতির শ্রেণীর গল্প রচনা করেছেন। তিনি প্রায় দেড়শ গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি হল— 'বন মর্মর' (১৯৩২) 'নরবাঁধ' (১৯৩৩) 'দেবী কিশোরী' (১৯৩৮) 'একদা নিশীথ কালে' (১৯৪২) 'দুঃখ নিশার শেষে' (১৯৪৪) 'পৃথিবী কাদের' (১৯৪৮) 'উলু' (১৯৪৮) 'খদ্যোত' (১৯৫০) 'কুঙ্কুম' (১৯৫২) ইত্যাদি।

মণীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯) ঃ যুবনাশ্ব ছদ্মনামে বেশি পরিচিত মণীশ ঘটককে বলা হত 'কল্লোলের প্রথম মশালচি' কারণ, বাস্তববাদী সাহিত্যের যে ব্রত কল্লোলীয় সাহিত্যিকদের অনুপ্রানীত করেছিল প্রথম সচেতনভাবে মণীশ ঘটক তার রূপদান করেন 'পটলডাঙার পাঁচালি'-তে। এই গ্রন্থে ন'টি গল্পে (গোষ্পদ, পটলডাঙার পাঁচালি, 'কালনেমি' 'মনু শেষ' 'মৃত্যুঞ্জয়' 'রাত-বিরেতে' 'ভূখা ভগবান' 'দুর্যোগ' 'স্বাহা') সেই বাস্তবতার আমদানি করেছেন লেখক। তবে **'যুবনাশ্বের রচনায় অভিনবতার চমক যত অপ্রত্যাশিত, অথবা যত উল্লাসেরই হোক, জীবনের স্থূল বস্তুভূমি থেকে তাকে সাহিত্যের নিত্যলোকে'**[১৯] উত্তীর্ণ করতে পারেন নি। ডঃ সুকুমার সেন মণীশ ঘটকের গল্প রচনার প্রয়াসকে **'গল্প চিত্র'** বলে অভিহিত করেছেন।[২০] দারিদ্র ও যৌনতার রূপ চিত্রণে তাঁর অদম্য উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) ঃ কল্লোলীয় জীবন চেতনার আর এক রূপকার অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। যৌবনের উন্মাদনা, বিদ্রোহ, অস্থিরতা, নিয়ম ভাঙার প্রবণতা ও সর্বোপরি রোমান্টিসিজম তাঁর গল্পে রূপ লাভ করেছে। 'কল্লোল'-এর দ্বিতীয় বর্ষের (১৩৩১) ৪র্থ সংখ্যায় তাঁর 'গুমোট' গল্পটি প্রকাশের পর 'কল্লোল গোষ্ঠীর' লেখক হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু। এক গরীব পরিবারের দাম্পত্য কলহের কাহিনী এটি। তাঁর 'বেদে' গল্পটিও কল্লোলীয় বিপ্লবের প্রথম নিদর্শন। যুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, প্রাণান্তকর জীবন সংগ্রাম-সব কিছুই অচিন্ত্যকুমারের গল্পে ফুটে উঠেছে। দরিদ্র মানুষের জীবন সংগ্রামের ও অসহায়তার জ্বলন্ত চিত্র 'ওষুধ' 'কালো রক্ত' 'ডাকাত' 'কেরাসিন' 'কেরামত' 'সারেঙ' প্রভৃতি গল্পে ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় মন্বন্তর ও দাঙ্গার ছবি পাওয়া যায় 'কালো রক্ত' 'যতন বিবি' 'চিতা-বাঘ' 'টান' ইত্যাদি গল্পে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলনগুলি হল— 'টুটাফুটা' (১৯২৮) 'ইতি' (১৯৩১) 'অধিবাস' (১৯৩২) 'অকাল বসন্ত' (১৯৩২) 'কালোরক্ত' (১৯৪৫) 'চাষাভূষা' (১৯৪৭) 'সারেঙ' (১৯৪৭) 'হাড়ি-মুচি-ডোম' (১৯৪৮)

'একরাত্রি' (১৯৬১) ইত্যাদি। তাঁর গল্পের প্রধান সুর 'যাযাবর চেতনা'— ভবঘুরে জীবনের বোহেমীয় দৃষ্টি।

সরোজ কুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩-১৯৭২) ঃ সরোজ কুমার রায়চৌধুরী 'কল্লোল' সমকালীন আর এক বিশিষ্ট লেখক। সমকালীন উত্তাল যুগপ্রবাহ, যৌবনের উচ্ছ্বলতা, মধ্যবিত্তের জীবন সংকট 'দারিদ্র্যের আস্ফালনের' চিত্র তিনি গভীর সংযমের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। তিনি তারাশঙ্করের মত গ্রাম্য জীবনের ছবি যেমন তাঁর গল্প-উপন্যাসে বিধৃত করেছেন তেমনি অজস্র ঝঞ্ঝা বিক্ষোভে আলোড়িত সমসাময়িক কালের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-বেদনার চিত্রও এঁকেছেন। তাঁর গল্প-সংকলন গুলি হল— 'মনের গহনে' (১৯৩৩) 'দেহ যমুনা' (১৯৩৩) 'ক্ষণবসন্ত' (১৯৩৪) 'শ্মশানঘাট' (১৯৩৪) 'বুহুৎসব' (১৯৩৭) 'রমণীর মন' (১৯৬০) 'সন্ধ্যা রাগ' (১৯৬১) ইত্যাদি।

শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০) ঃ 'কল্লোলের' কালে আবির্ভূত আর এক হাস্যরসিক লেখক শিবরাম চক্রবর্তী। 'কল্লোলে' ১৩৩১ বঙ্গাব্দে (১৯২৪) তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'আর এক ফাল্গুনে' নামে। তিনি অনেক কবিতাও লিখেছেন, যাতে রবীন্দ্রোত্তরণের কল্লোলীয় প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 'মানুষের প্রারম্ভ' 'বিধাতার চেয়ে বড়' এধরনের কবিতা। তবে ছোটগল্পে তিনি ছোটদের জন্য হাসিখুশির পসরা সাজিয়েছেন। তাঁর একটি গল্প সংকলন হল— 'বড়দের হাসিখুশি'।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) ঃ কল্লোলের ভাবধারার ধারক ও বাহক শ্রেণির লেখক হলেও প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কল্লোলের' শিল্প নন। কেননা, 'কল্লোলের' পূর্বে 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৩০-এর চৈত্র সংখ্যায় তাঁর 'শুধু কেরানী' গল্পটি বের হয়েছিল। 'বিজলী' পত্রিকাতেও তিনি নিয়মিত লিখতেন। পরে 'কল্লোলের' সংস্পর্শে এলেও তিনি কল্লোল ছেড়ে 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদনা ও লেখার কাজে নিযুক্ত হন। তিনি একাধারে কবি, বিজ্ঞানী ও গল্পকার। তাই তাঁর গল্পে কবির কাব্যময়তা, বিজ্ঞানীর নিরাসক্তি দৃষ্টিভঙ্গি এবং গল্পকারের সহমর্মিতাবোধ যুক্ত হয়েছে। **'তাঁর মধ্যে একাধারে সংগ্রামীও পলাতক বিজ্ঞান মানস এবং আদিমতা-সংসক্তি'**[২১] প্রকাশিত। নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের নিরুপায় ব্যর্থতা ও আদর্শচ্যুতি, অসহায়তা, বিকৃতি ও নির্মমতার রূপকার প্রেমেন্দ্র মিত্র; সেই সঙ্গে মহানগরের ধূসর অমানবিকতা, জটিলতা, বিষাক্ততার পরিচয়ও তাঁর গল্পে আছে। 'শুধু কেরানী' 'পুন্নাম' 'ভবিষ্যতের ভার' 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' 'হয়তো' 'মহানগর' 'সংসার সীমান্তে' 'স্টোভ' প্রভৃতি গল্পে এসব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তবে নিষ্ঠুরতার নির্মম রূপায়ণের পাশাপাশি রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্নাভিসার ও রয়েছে। প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প সংকলনগুলি হল— 'বেনামী বন্দর' (১৯৩০) 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৯৩১) 'অফুরন্ত' (১৯৩২) 'পঞ্চাশর' (১৯৩৪) 'মৃত্তিকা' (১৯৩৫) 'মহানগর' (১৯৩৭) 'ধূলিধূসর' (১৯৩৮) 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' (১৯৪০) 'সামনে চড়াই' (১৯৫০) 'সপ্তপদী' (১৯৫৩) 'জলপায়রা' (১৯৫৭) 'প্রেমই ধন্বন্তরী' (১৯৫৮) 'নানা রঙে বোনা' (১৯৬০) ইত্যাদি।

প্রবোধ কুমার সান্যাল (১৯০৭-১৯৮৩) ঃ 'কল্লোল' ভাবধারার আর এক বিশিষ্ট লেখক প্রবোধ কুমার সান্যাল। ১৯২৩-এর মাঘ সংখ্যায় 'মার্জনা' গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রবোধ কুমারের সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ। কল্লোলের প্রতিবাদী মানসিকতায় বর্ধিত হলেও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ধর্মে তিনি বোহেমিয়ানিজমকে প্রসারিত করে দিয়েছেন। তাই তাঁর গল্প উপন্যাসে সে সব চরিত্র পাই তারা আবেগ উদ্দীপনায় দীপ্ত পোড়খাওয়া মানুষ। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর সাহিত্যে তিনি রূপ দিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পে কল্লোলের বিদ্রোহী চেতনা, অবক্ষয়, ব্যর্থতাবোধ, দারিদ্র্যবিলাস যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে রোমান্টিক স্বপ্নমেদুরতা, যাযাবর বৃত্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের জটিল জীবনসংগ্রামের চিত্রও তিনি এঁকেছেন। 'গুহায় নিহিত' 'অবৈধ' 'বনমানুষের হাড়' 'প্রেতিনী' 'নিশিপদ্ম' 'অঙ্গার' 'কল্পান্ত' প্রভৃতি গল্পে এসব চিত্র বিধৃত। তাঁর গল্প সংকলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'চেনা-অচেনা' (১৯৩১) 'নিশিপদ্ম' (১৯৩৩) 'অবিকল' (১৯৩৩) 'দিবাস্বপ্ন' (১৯৩৬) 'অন্তরাগ' (১৯৩৭) 'কয়েক ঘন্টা মাত্র' (১৯৩৯) ইত্যাদি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন 'কল্লোলের কুলবর্ধন'। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন 'belated kollolian।' কিন্তু এসব অভিধা থেকে কিছুটা ভিন্ন গোত্রের মানিক। কারন, তিনি কল্লোলীয় আদর্শকে গ্রহণ করেছেন বটে, তবে তা সংযমের সূত্রে ও চিন্তার গভীরতায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন— **"মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংশয়, হতাশ, ব্যর্থতাবোধ ও অসহায়তাবোধের কাছে পরাজয় মেনে নেন নি। মানিকের গল্প পাঠককে কুলহারা জীবন রহস্যের দিকে ঠেলে দেয় না, সংগ্রামী সংকল্প কঠিন মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি করিয়ে দেয়। বিজ্ঞানবুদ্ধি, সত্য-এষণা, বস্তুজিজ্ঞাসা মানিকের শিল্পীমানসকে গোড়া থেকেই ভাবালুতার হাত থেকে রক্ষা করেছে।"**[২২] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'অতসী মামী' বের হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (১৯২৮)। দুই বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রাম, সংকীর্ণতা ও কৃত্রিমতাজনিত স্বপ্নভঙ্গ, হতাশা, বিকার, নিঃসঙ্গতাবোধ মানিক বৈজ্ঞানিক মনন ও বুদ্ধি দিয়ে সমকালীন জীবনের বাস্তব সত্যকে উপস্থাপিত করেছেন। **"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে ঔপনিবেশিক সমাজের অন্তেবাসী মানুষেরা যখন বিপন্নতর হচ্ছিল, সময়-মন্থনজাত জীবন-জিজ্ঞাসার নতুন নতুন ধরন"** দেখা গেল বাংলা ছোটগল্পের জগতে। **"চল্লিশের দশকেই সাম্রাজ্যবাদী অপশাসনের অন্ধকার আরো হিংস্র হয়ে ওঠে। এই নিশিছদ্র অন্ধকারের মধ্যে মানুষের চূর্ণ-বিচূর্ণ পরিসর ও অবয়ব ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান ছিল না। দুঃসহ এই সময়ের গল্প লিখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।"**[২৩]তবে কল্লোলীয় যৌবনরাগ যৌনচেতনা ও রোমান্টিক মানসিকতাও তাঁর গল্পে স্বতঃ প্রকাশিত। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি হল— 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩৫) 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭) 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮) 'সরীসৃপ' (১৯৩৯) 'বৌ' (১৯৪৩, মতান্তরে ১৯৪০) 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩) 'ভেজাল' (১৯৪৪) 'হলুদ

পোড়া' (১৯৪৫) 'আজ-কাল-পরশুর গল্প' (১৯৪৬) 'পরিস্থিতি' (১৯৪৬) 'খতিয়ান' (১৯৪৭) 'মাটির মাশুল' (১৯৪৮) 'ছোটবড়' (১৯৪৮) 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' (১৯৪৯) 'ফেরিওলা' (১৯৫৩) 'লাজুকলতা' (১৯৫৪)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিককার গল্পে ন্যাচারালিস্ট লেখকের মানসিকতা ধরা পড়েছে- একেবারে জৈবস্তরের মানুষ (প্রাগৈতিহাসিক), আপাতসভ্য মানুষের মধ্যেও আদিম যৌন ও অর্থ লিপসা (সরীসৃপ) ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে মার্কসবাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বিশ্বাসে পরিণত হলে যে গল্পগুলি তিনি লিখেছেন তাতে প্রাধান্য পেয়েছে ধনিক শ্রেণির শোষণ (দুঃশাসনীয়), দুঃস্থ শিল্পীর নির্যাতন (শিল্পী), রাজনৈতিক আন্দোলন ও দিনবদলের ইঙ্গিত (হারানের নাত জামাই) প্রভৃতি। অর্থাৎ এই স্তরের সাহিত্যে একটা দায়বদ্ধতার পরিচয় পরিস্ফূট।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ঃ অচিন্ত্যকুমার ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাল্য বন্ধু বুদ্ধদেব বসু যে কল্লোলের নেশায় মদির হয়ে গল্প লিখবেন এটাই স্বাভাবিক। বুদ্ধদেব মূলত কবি, তাই তাঁর গল্পে কবিত্বময় ভাবনা অতিমাত্রায় উপস্থিত। কল্লোলীয় রোমান্টিক মদমত্ততায় তিনি যে বেশ ডুবে ছিলেন, তা তাঁর গল্প পাঠেই বোঝা যায়। তার সঙ্গে যৌবনের উন্মাদনা, যৌনতার প্রতি স্পৃহা, আর নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের তিক্ততা অপেক্ষা প্রেম প্রীতি, আশা-ভালোবাসা, আবেগ-স্মৃতি মেদুরতা। তবে প্রেমের গল্প ছাড়াও বুদ্ধদেব ক্ষোভ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, প্রতারণা প্রভৃতি বিষয়ে গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্প সংকলনগুলি হল— 'অভিনয়, অভিনয় নয়' (১৯৩০) 'রেখাচিত্র' (১৯৩১) 'এরা আর ওরা' (১৯৩২) 'অদৃশ্য শত্রু' (১৯৩৩) 'মিসেস গুপ্ত' (১৯৩৪) 'প্রেমের বিচিত্র গতি' (১৯৩৪) 'অসামান্য মেয়ে' (১৯৩৫) 'ঘরেতে ভ্রমর এলো' (১৯৪১) 'ফেরিওয়ালা' (১৯৪১) 'খাতার শেষ পাতা' (১৯৪৩) 'হাওয়াবদল' (১৯৪৪) 'একটি কি দুইটি পাখী' (১৯৫৫) ইত্যাদি।

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০) ঃ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর সুবোধ ঘোষ বাংলা ছোটগল্পের ভূগোলকে বিস্তৃত করেছেন। কলকাতা থেকে হাজারীবাগ, রাঁচি, গিরিডি, পশ্চিম ভারত পর্যন্ত তাঁর গল্পের ভূমি বিস্তৃত। তিনি বাস্তবতার নতুন রূপ চিত্রণ করেছেন তাঁর গল্পে। সামাজিক-অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের নতুন ব্যাখ্যা,মানুষের মনোগহনের জটিলতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, মধ্যবিত্ত মনের দোলাচলতা, দ্বিধা, স্বার্থপরতা নানাভাবে উদঘাটিত হয়েছে তাঁর রচনায়। মোহহীন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জীবনকে তিনি দেখেছেন, মানুষের শুভ বুদ্ধি উদয় হবে এ বিশ্বাস তাঁর অটল ছিল। তাঁর প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' বের হয় ১৯৪০ -এ আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক দোল সংখ্যায়। এ গল্প থেকেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। এছাড়া, 'জগদ্দল', 'সুন্দরম', 'গোত্রান্তর' 'নির্বন্ধ' 'কাঞ্চন সংসর্গাৎ' 'তিন অধ্যায়' 'স্নানযাত্রা' 'বারবধূ' 'জতুগৃহ' 'গরল অমিয় ভেল, প্রভৃতি গল্পে তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত।

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫) ঃ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর এক স্বনামধন্যা লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী। বাংলা ছোট গল্পের আসরে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ায় অবতীর্ণ হন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় তার প্রথম গল্প ছাপা হয়। নাম— 'পত্নী ও প্রেয়সী'। মধ্যবিত্ত পরিবারের নানা পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মানুষের মনো-দ্বন্দ্ব তাঁর গল্পে রূপায়িত। তবে

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু মেয়েদের জীবনের স্বাধিকারের কথা, নানা ব্যর্থতা বেদনার কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তবে নারীবাদী লেখিকা হলেও নারী সমাজের প্রতি তাঁর পক্ষপাত দেখা যায়নি। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অবস্থান, তাদের জীবন সংগ্রামের কথা তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ছোটদের জন্য 'ছোট ঠাকুরদার কাশীযাত্রা' (১৯৩৮) বড়দের জন্য প্রথম গল্প-সংকলন 'জল আর আগুন' (১৯৪০)। তাঁর ছোটগল্প সংকলন সংখ্যা—তিরিশটি।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৬) ঃ 'বঙ্গবাণী'-'নবশক্তি'-'পূর্বাশা'-'প্রগতি'-'দেশ'-'চতুরঙ্গ'-'ভারতবর্ষ' গোষ্ঠীর লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী যুগের লেখক। তার প্রথম মুদ্রিত রচনা ঢাকার 'বঙ্গবাণী' সাপ্তাহিক পত্রিকায় বের হয়। গল্পটি মোপাসাঁর অনুদিত গল্প, নাম— 'জার্নালিস্ট'। তিনি মূলত মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। এই সময়ের মধ্যে কালোবাজার, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদি কারণে সমাজে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল চিরন্তন মূল্যবোধ সমূহের এবং যেখানে কোনমতে টিকে থাকাটাই হয়ে উঠেছিল কাম্য। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে এই বিপর্যস্ত ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মানুষগুলির চিত্র আছে। মনস্তত্ব, মনোবিকলন, প্রকৃতি প্রীতি, সৌন্দর্য পিপাসা, যৌনবিকৃতি প্রভৃতি স্থান পেয়েছে তাঁর গল্পে। 'নদী ও নারী' 'অনাবৃষ্টি' 'রাইচরণের বাবড়ি' 'মঙ্গলগ্রহ' 'পালিশ' 'কমরেড' 'রাধিকা' 'বনানীর প্রেম' 'শালিখ কি চড়ই' 'গিরগিটি' 'সমুদ্র' 'হিংসা' 'গাছ' 'শ্বাপদ' 'পঙ্গু' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গল্প।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭০) ঃ ১৯৩৬-এ 'দেশ' পত্রিকায় 'মৃত্যু ও জীবন' নামে নরেন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গল্প বের হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালের লেখক ইনি। ফলে যুদ্ধ, মন্বন্তর, কালোবাজার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা—এসব কিভাবে জীবনকে ভেঙে দিচ্ছে তা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন। মূলত মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনচিত্র তাঁর গল্পে বিধৃত। তাঁর নিজের কথায়— **"ঘৃণা, বিদ্বেষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বৈরিতা আমাকে লেখায় প্রবৃত্ত করে নি। বরং বিপরীত দিকের প্রীতিপ্রেম, সৌহার্দ্য, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, পারিবারিক গন্ডীর ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।"** ১৯৪৫ -এ মুদ্রিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অসমতল'। এরপর একে একে বের হয় 'হলদেবাড়ি' (১৯৪৫), 'উল্টোরথ' (১৯৪৬), 'পতাকা' (১৯৪৭), 'চড়াই-উৎরাই' (১৯৪৯), থেকে 'পালঙ্ক' (১৯৭৫) পর্যন্ত বিভিন্ন গল্প সংকলন। 'সেতার', 'অনধিকারিণী', 'ছদ্মনাম', 'স্বাধিকার', 'কুমারী শুক্লা', 'নাম', 'শাল', 'পালঙ্ক', 'রস', 'চড়াই-উৎরাই' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গল্প।

নবেন্দু ঘোষ (১৯১৬-) ঃ 'শনিবারের চিঠি' (একটি বর্ষার সন্ধ্যা) 'পরিচয়' 'প্রভাতী' কেন্দ্রিক চল্লিশের দশকের ছোটগল্পকার নবেন্দু ঘোষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের আন্দোলন,

পঞ্চাশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, দেশ ভাগ—— সবই ছিল তাঁর গল্পের বিষয়। 'প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘ' এবং 'গণনাট্য সংঘ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। জীবন-মৃত্যুর বৃহত্তর পটভূমিতে জীবনমুগ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে নানা আকারে। 'এই সীমান্তে' 'মানুষ' 'পোষ্টমর্টেম' 'ইস্পাত' 'কান্না' ১৯৪৬-১৯৪৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত গল্প সংকলন। এছাড়াও আছে 'পঞ্চম রাগ' 'সিঁড়ি' 'রাতের গাড়ি' প্রভৃতি গল্প গ্রন্থ। 'ঈশানপুরের শ্মশান', 'সুখের ঠিকানা', 'প্রমীলার প্রেমিক', 'কল্কি', 'ত্রানকর্তা' ,'কান্না', 'উলুখর', 'জীবিকা', 'কাকভূশণ্ডি কথা' তাঁর বিখ্যাত গল্প।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায় যুগচেতনার সঙ্গে ব্যক্তিচেতনা অঙ্কিত। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'নিশীথের মায়া'। তিনি যখন লিখতে শুরু করেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধকালীন বিপর্যস্ত মানবজীবন, কালোবাজারী, মন্বন্তর, দাঙ্গা, সাধারণ মানুষের দুর্দশা ইত্যাদি তাঁর গল্পে চিত্রিত। 'নক্রচরিত', 'পুষ্করা', 'ভাঙাচশমা', 'টোপ', 'বন-জ্যোৎস্না', 'হাড়', 'দুঃশাসন' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গল্প। তাঁর ২১ টি গল্প সংকলন আছে —— 'বীতংস' (১৯৪৫) 'দুঃশাসন' (১৯৪৫) 'ভাঙ্গা বন্দর' (১৯৪৫) থেকে 'আলেয়ার রাত' (১৯৮১) পর্যন্ত।

এরপর সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২), সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫), ননী ভৌমিক (১৯২১-১৯৯৭), বিমল কর (১৯২১-২০০৩), রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) প্রমুখের 'দেশ' 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। এঁরা সকলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালের সর্বনাশা ভাঙনের চিত্র, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা, গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা গল্পে রূপায়িত করেছেন আপন আপন বিশিষ্ট ভঙ্গি অনুসারে।

17 DEC 2012

আমার আলোচনার সমকালের (অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা বাংলা ছোটগল্পের আসরে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মানসপ্রবণতা উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে বলে মনে করি। তবে আলোচনার সীমা রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করার কারণ হলো বনফুলের সাহিত্য রচনার সমকালে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। আমি আমার আলোচনার প্রেক্ষাপট ততদূর বিস্তৃত করেছি, বনফুল যতদিন পর্যন্ত লিখেছেন। এই দীর্ঘকাল পরিক্রমায় বিশিষ্ট লেখকদের বিশেষ মানসপ্রবণতা ও যুগ সংকটের অর্ন্তগূঢ় আলোচনা করে তাঁর বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করাই আমার অভীপ্সিত।

"সমাজের খণ্ডিত ও বিভিন্ন অংশের জীবন সত্যই হোক, আর সমাজের বৃহত্তর জীবনসত্যই হোক, সে সত্য কতটুকু রূপায়িত হবে তা নির্ভর করবে জীবনের খণ্ডগুলি বেছে নেওয়ার উপর। .....জীবনের খণ্ডাংশগুলি স্বভাবতই বাছাই হবে লেখকের চেতনা ও অভিজ্ঞতা অর্থাৎ জীবন-দর্শন অনুসারে।"[২৪] ছোটগল্প যেহেতু জীবনের খণ্ডাংশে পূর্ণ জীবনের দ্যোতনা সৃষ্টি করে সেহেতু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত মন্তব্য সর্বৈবভাবে সত্য। কেননা, এই

241096

'চেতনা' ও 'অভিজ্ঞতার' রূপায়ণে এক লেখক অন্য লেখক থেকে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে ভাববাদও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের আকাশবিহারী কল্পনা, রোমান্টিক স্বপ্নাভিসার সেদিনকার গল্পলেখকদের কাছে তেমন আপত্তিকর কিছু ছিল না, বরং বহুল পরিমাণে গ্রহণীয়ই ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে মানুষের জীবনযাত্রার মান পাল্টে যাওয়ায় সামাজিক পরিস্থিতি পাল্টে যাওয়ায় তাঁদের আর তখন ভাববাদ নয় বস্তুবাদ প্রধান হয়ে উঠল। অবশ্য এর পেছনে এমিল জোলার ন্যাচারালিজমের প্রচার ও প্রসার একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এছাড়া, ফ্রয়েডের মনস্তত্ব বিষয়ক গ্রন্থ 'The Interpretation of Dreams'(১৯১৩),'The psychology of everyday life'(১৯১৪), 'On Dreams'-এর ইংরেজি অনুবাদ, ইয়ুং ও অ্যাডলার হ্যাভলক এলিসের রচনার অনুবাদ, উলফ্, প্রুস্ত, ন্যুটহ্যামসুন, লরেন্স গোর্কি, হকিন্স—প্রমুখের রচনা বিশেষ প্রেরণা যুগিয়েছিল। আসলে বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ। তাই সাহিত্য বিজ্ঞান নির্ভর হয়ে পড়তে থাকল। এর ফলে জীবনকে আর আবেগের সাহায্যে বিচার বিশ্লেষণ নয়, যুক্তিবাদের মধ্য দিয়ে গৃহীত হতে লাগল। স্বভাবতই তথাকথিত রাবীন্দ্রিক রোমান্টিক ভাবালুতা থেকে বিংশ শতাব্দীর তরুণ লেখকেরা সরে আসতে চাইলেন যতটা সম্ভব। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে 'কল্লোল'- 'কালিকলম'- 'প্রগতি' গোষ্ঠীর আবির্ভাব। আসলে ১৯০৫-১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সামাজিক রাষ্ট্রীয় অস্থিরতাই 'কল্লোল'-কালিকলম-প্রগতি'-র মত পত্রিকাকে জন্ম দিতে উদ্বোধিত করেছিল, যতটা না রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। কারণ, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ পরিবর্তনের চাইতে সার্বিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীক অস্থির পরিস্থিতির প্রভাব তাঁদের মনকে বিচলিত করেছিল বেশি। কারণ এমন কোন জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি সেদিন বাঙালিকে দাঁড়াতে হয় নি, যতটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে হয়েছে। কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে 'কল্লোলের' চেতনা ও মতাদর্শ জন্ম নিয়েছিল। তাই সেদিন তরুণ লেখক সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে 'বিদ্রোহ' করে বেড়িয়ে আসতে চেয়েছিলেন। তাঁদের বিদ্রোহটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। এবিষয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন— **"যাকে 'কল্লোল' যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।"**[২৫] কিন্তু এসব তরুণ লেখক বাইরে বিরোধিতা করলেও ভেতরে ভেতরে ঠিকই বুঝেছিলেন, প্রতিভার বিশাল মহীরূহ রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে যাওয়া অত সহজ ব্যাপার নয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাই লিখেছিলেন—

"সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ম আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর।"[২৬]

—'উদ্ধত কণ্ঠে' উচ্চারিত এই 'বিদ্রোহ বাণী' অচিন্ত্যকুমার সেদিন ঘোষণা করেছিলেন। বলাবাহুল্য তিরিশের দশকের গল্পকারেরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদর্শকে পরিত্যাগ করতে প্রতিশ্রুত

হয়েছিলেন বা বলতে পারি বাধ্য হয়েছিলেন। যদিও এখানে একটি কথা বলার যে, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের গল্পে তৎকালীন যুগজীবনের ছায়া কিন্তু খানিকটা হলেও উপস্থিত। 'হালদার গোষ্ঠী' 'নষ্ট নীড়' 'নামঞ্জুর' 'স্ত্রীর পত্র' 'তিন সঙ্গী-র' 'রবিবার'-'শেষকথা'-'ল্যাবরেটরি' ও অন্যান্য গল্পে তা রূপায়িত। কিন্তু 'কল্লোল' যুগ যে 'বাস্তবতা' চাইছিল তা রবীন্দ্রসাহিত্য পূরণ করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মনোভাব— **"রবীন্দ্রনাথের পাত্রপাত্রীরা প্রায় সকলেই দ্বিরায়তনিক; যথাযোগ্য শরীরের অভাবে ঈষৎ পাণ্ডুর। .....এইসব মানুষ তাদের স্রষ্টার দ্বারা আরোপিত অসামান্যতার ভার বইতে গিয়ে ঠিক যেন মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।"**[২৭] একথা যেন শুধু বুদ্ধদেবের নয়, 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সকল তরুণ লেখক গোষ্ঠীর। কারণ সেদিনের তরুণ লেখকবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে 'বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা', 'সংরাগের তীব্রতা', 'জীবনের জ্বালা যন্ত্রণার চিহ্ন' খুঁজে পায়নি। তাঁদের চোখে **'জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসও Classical আবার রবীন্দ্রনাথও Classical'**। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কল্লোল গোষ্ঠীর এই উদ্ধত যৌবনধর্মী লেখা আর দারিদ্র্যের আস্ফালনের প্রকাশ তেমন মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেন নি।

যেটা বলছিলাম, বস্তুবাদ আর ভাববাদের দ্বন্দ্বে বিংশ শতাব্দী বস্তুবাদকেই তার সাহিত্যের প্রকাশমাধ্যম হিসেবেগ্রহণ করল। বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ, বিশ্বায়ণের যুগ। তাই এযুগে স্বভাবতই বস্তুবাদ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। অবশ্য এর পেছনে পাশ্চাত্য সাহিত্য ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। তরুর লেখকগণ যে 'বাস্তবতা'- র অন্বেষণ করছিলেন, তা তাঁরা খুঁজে পেলেন পাশ্চাত্য লেখকদের রচনায়। তাঁরা সেই সব সাহিত্য 'গলাধঃকরণ' করে তৃপ্ত হলেন। ফ্রয়েডের ও এলিসের মনস্তত্ব, যৌনচেতনা, যৌনতত্ত্ব, মনোবিকলনতত্ত্ব, লরেন্সের আদিম দেহচেতনা ন্যুট হ্যামসুনের (১৮৫৯-১৯৫২) দারিদ্র্যের চিত্র সেদিন তাঁদের উন্মত্ত করে দিয়েছিল। 'Age of Interrogation'-এর যুগে এইসব তরুণ লেখক বিদেশী সাহিত্যই যেন তাঁদের সবচেয়ে বেশী প্রেরণা দিয়েছিল। কারণ, তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, সামাজিক পরিস্থিতি আমাদের বাংলার চাইতে কোন অংশে কম ছিল না, বরং বেশীই ছিল। ১৩৩৩ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ঘাটশিলা থেকে একটি পত্রে তাই প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন **'..... জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন গোর্কির পাঠশালায় গিয়ে থাকি তাতে দোষ কি.....'** 'বাস্তবতা'র উপকরণ আহরণে তাই কল্লোলীয় লেখকগণ বিদেশী সাহিত্য পাঠ করেছিলেন। অবশ্য সে সময় বিদেশী সাহিত্য পাঠ একটি 'ফ্যাশান'-এরও অঙ্গ ছিল। এই বিদেশী সাহিত্য পাঠের ফলে ইউরোপীয় সাহিত্যের উদগ্র বস্তুবাদ বাংলার অঙ্গনে উগ্রমূর্তি নিয়ে প্রবেশ করতে লাগল। এবং সেই প্রবণতা 'কল্লোল' 'কালি-কলম'- 'প্রগতি'- 'উত্তরা' পর্যন্ত প্রবাহিত। বস্তুতঃ পক্ষে 'কল্লোল' বলতে শুধু 'কল্লোল' পত্রিকা নয়, তার সঙ্গে 'কালি কলম'-'প্রগতি'-'উত্তরা'-'ধূপছায়া'-'পূর্ব্বাশা' পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীকেও বোঝায়। এমনকি 'সবুজপত্র' (১৯১৪) যুগের 'নারায়ণ' (অগ্রহায়ণ, ১৩২১) পত্রিকাও এর মধ্যে পড়ে মনোভাবের দিক থেকে। কারণ 'নারায়ণ' পত্রিকা থেকেই রবীন্দ্র বিরোধিতা এক অন্যমাত্রা পায়। তবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে

কল্লোলীয় সাহিত্য ছিল 'রিয়ালিটির কারি পাউডার।' তিনি কল্লোলীয় লেখকদের অসংযত উন্মাদনাকে সমর্থন করতে পারেন নি। যৌবনের ধর্ম আবেগ প্রবণতা, রোমান্টিক প্রবণতা। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের রচনায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবিসয়ে বলেছেন—
" 'কল্লোলের' সে যুগটাই সাহসের যুগ, সে সাহসে রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো।"[২৮]

যেটা বলছিলাম, বস্তুবাদী বিজ্ঞান চেতনা বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের একটি বিশেষ আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। তবে কল্লোলীয় তরুণ লেখকবৃন্দ পাশ্চাত্য সাহিত্যের 'বাস্তবতা' বাংলা সাহিত্যে আমদানী করতে গিয়ে জীবনের পঙ্কিল, ঘৃণ্য কদর্য দিকটাকেই 'বাস্তব সত্য' বলে মনে করেছেন। সে কারণে তাঁদের সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রে একপেশে হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'কল্লোল' যে 'বাস্তবতার' কথা বলেছে সে বাস্তবতা যে পূর্বে একেবারেই সাহিত্যে ছিল না তা নয়, কল্লোল যুগে সে বাস্তবতা আরো তীক্ষ্ণ-তীব্রভাবে প্রকাশ পেল। এইভাবে 'বাস্তবতা'র দোহাই দিয়ে 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখকরা যৌন চেতনাকে সাহিত্যে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছিলেন দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ের মানুষের ভাঙাচোরা জীবনের রূপ চিত্রণে।

কিন্তু তথাকথিত আধুনিকতার ধাক্কা 'কল্লোল' -এর যুগের বনফুলের লেখায় লাগে নি। তিনি কল্লোলীয় যুগের সাহিত্যের উচ্ছৃঙ্খলতাকে সাহিত্য রচনার প্রকৃত পথ বলে মনে করতেন না, তিনি ছিলেন সমস্ত গোষ্ঠী ও মতবাদের উর্দ্ধে। তবে তাঁর কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি মনস্তাত্বিক, কি আধ্যাত্মিক, কি অলৌকিক-সমস্ত বিষয়ে সমান কৌতূহল ছিল। তাঁর প্রথম ছোট গল্প 'চোখ গেল' কল্লোল(১৯২৩) পূর্ব 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের (১৯২২) আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী' ছাড়াও বনফুল 'শনিবারের চিঠি' 'ভারতী' 'ভারতবর্ষ' 'মাসিক বসুমতী' 'বিচিত্রা' 'যুগান্তর' 'কথাসাহিত্য' 'অলকা' 'বঙ্গলক্ষ্মী' 'বিজলী' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তিনি মনে করতেন, সাহিত্যিকদের নীলকণ্ঠ হতে হয়, তাঁদের গরল গলাধঃকরণ করে অমৃতই পরিবেশন করতে হয়। বাংলা সাহিত্যকে তিনি সেই অমৃতই দিয়েছেন, যা আস্বাদনে, বৈচিত্র্যে, প্রকাশভঙ্গিতে, শিল্পপ্রকরণে অভিনব। বাংলা সাহিত্যে তিনিই একটি জগৎ সৃষ্টি করলেন, কিম্বা বলতে পারি তাঁর রচিত সাহিত্যে আপনা-আপনি একটি জগৎ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। যা তাঁকে এক ব্যতিক্রমী শিল্পী হিসেবে পরিচিতি দান করেছিল।

বনফুল জীবনকে কখনো রোমান্টিসিজমের মোহে ভাববিলাসের দৃষ্টিতে দেখেন নি। জীবন তাঁর কাছে স্বপ্নিল কল্পনামাত্র ছিল না। জীবন তাঁর কাছে এক শাশ্বত সত্যে উদ্ভাসিত হয়েছিল। সে কারণে আপাত তুচ্ছ সাধারণ নগণ্য মানুষের জীবনকথা তাঁর গল্পসাহিত্যে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। আপাত তুচ্ছ এই মধ্যবিত্ত নর-নারীর ধূলিমলিন জীবন তাঁর সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিভাত, যা তৎকালীন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার উত্তপ্ত উচ্ছ্বসিত পরিবেশে এক নতুন স্বাদ পাঠককে দিয়েছিল।

বনফুলের গল্পে তৎকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উত্তাল বিক্ষুব্ধ সময় স্রোতের প্রত্যক্ষ চিত্র

যতটা না ফুটে উঠেছে, তার চেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে সেই সময়ের তরঙ্গাঘাতে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের অন্তর্লীন জীবন-জিজ্ঞাসা। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা বনফুলের যে একেবারে 'নতুন কিছু' আমদানি তা নয়, ইতিমধ্যে তা অনেকে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। তবে সে জীবনকে একজন বিজ্ঞান নিষ্ঠ সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করার প্রবণতা 'একেবারে নতুন'। বনফুল তাঁর গল্পের চরিত্র-চিত্রের উপর যে নির্মোহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করেছেন, তাতে তিনি যথার্থই 'আধুনিক' ও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। কারণ কথা সাহিত্যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ একেবারে আধুনিককালের ঘটনা। **"বাংলা কথা সাহিত্যে এই বিজ্ঞানচেতনা দেখা দিয়েছে বিশ শতকে। বিশেষভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে- ফ্রয়েড হ্যাভলক এলিস প্রমুখ পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীদের প্রভাবে— নর-নারীর মনোজীবনের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মধ্যে। সেই বিজ্ঞান চেতনা এক সুপরিস্ফুট অভিনব রূপলাভ করেছে বনফুলের রচনায়।"**[২৯]

বনফুল তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিকে নির্মোহ সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন বলেই অপক্ষপাত চরম জীবনসত্য তাতে রূপায়িত হয়েছে। তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি মানবিক অনুভূতিরও প্রকাশ সেখানে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে, যে কারনে তাঁর গল্পগুলি এত অনুভূতির গাঢ়তায় ঋদ্ধ। তাঁর প্রগার অনুভূতিশীল মন ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনোভঙ্গির প্রতিনিয়ত একটা বৈপরীত্যজনিত দ্বন্দ্ব দেখা যায়, যা তাঁর গল্পগুলিকে এক বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। তবে এদু'য়ের দ্বন্দ্বে মানবসত্যই জয়লাভ করেছে তাঁর গল্পে। বনফুল তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিকে এক বিশেষ পরিস্থিতিতে ফেলে তাঁদের গূঢ় মানস প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেছেন। চরিত্রগুলির মানস প্রতিক্রিয়া আমাদের কখনো হাসিয়েছে, কখনো ভাবিয়েছে, কখনো হতবাক করেছে অবাক বিস্ময়ে। তবে তাঁর গল্পের মধ্যে যে হাস্যরস ফুটে উঠেছে মানবচরিত্র ও মানব জীবন সম্পর্কে তা কখনো শ্লেষবোধক, কখনো তির্যক, কখনো বা ব্যঞ্জনাধর্মী। **"কিন্তু বনফুলের ব্যঙ্গ তীক্ষ্ম ধারালো হলেও বনফুল হৃদয়হীন নন। মানুষকে নিয়ে পরিহাস করেছেন, তার ত্রুটি দুর্বলতা কিংবা হীনতা, নীচতা ও কৃত্রিমতা নিয়ে কঠিন ব্যঙ্গও করেছেন। কিন্তু সেই ব্যঙ্গের অন্তরালে মানুষের অসহায়তার প্রতি তাঁর সহৃদয় কারুণ্যমিশ্রিত মমত্ববোধ আশ্চর্য রসব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।"**[৩০]

জীবন রসিক বনফুলের গল্পে আমরা প্রাণোজ্জ্বল জীবন কথাকেই খুঁজে পাই। তাঁর গল্পে দুই বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের চিত্র যেমন আছে, তেমনি আছে এক চলমান জীবনের অনুভূতি— যে জীবন অখণ্ড জীবন স্রোতের সঙ্গে যুক্ত। বনফুলের গল্পে তাই হাজারো বিপর্যয়ের মধ্যে জীবনে চলার কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। জীবনে চলার ও জীবনকথা বলিষ্ঠরূপে প্রকাশ করার প্রবণতায় বনফুল বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন।

সমকালীন সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সাহিত্যে পড়বেই। সমকালকে সাহিত্যে

রূপ না দিলে সাহিত্য যেমন বাঁচে না, আবার সমকালকে আঁকড়ে ধরলেও সাহিত্য বাঁচে না, তার জন্য সাহিত্যে সার্বজনীন সত্যের সম্পূর্ণ প্রকাশ একান্ত প্রয়োজন। বনফুল সমকালকে ধরে, সমকালকে অতিক্রম করে এক চিরন্তন বিশ্বজনীন সত্যকে রূপ দিয়েছে তাঁর গল্পে। এখানেই তিনি জীবনের যথার্থ রূপকার। তাই তাঁর গল্প এত সত্য-সুন্দর সরল অথচ বলিষ্ঠ জীবন প্রত্যয়ে বিশ্বাসী বলে মনে হয়। জীবনের প্রতি এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রূপায়ণে বনফুলকে সমকালীন সাহিত্যিকদের চেয়ে বিশিষ্ট করে তুলেছে। বনফুলের প্রথম গল্প 'চোখ গেল' থেকে শুরু করে 'বনফুলের শেষ লেখা'-র গল্পগুলি পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে উক্ত কথাগুলির সত্যতা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। যা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমার আলোচনার অভিষ্ঠ।

খণ্ড জীবন নয়, সমগ্র জীবন অন্বেষাই বনফুলের শিল্পীমনের অন্তর্গূঢ় এষণা। তাই জীবন অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে তিনি যা কিছু দেখেছেন, যা কিছু তাঁর 'পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ' বলে মনে হয়েছে তাকে তিনি সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। তিনি সমগ্র জীবন জুড়ে যে বিচিত্র মানুষ দেখেছেন, মানুষের যে বিচিত্র প্রবণতা দেখেছেন তাকে অপক্ষপাতহীন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে অনুভূতির রসে জাড়িত করে সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। মানব জীবনের বৈচিত্র্যই বনফুলকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি 'শনিবারের চিঠি' (১৩৫৬, ভাদ্র) -তে এক জায়গায় বলেছেন— **"জীবনের নানা বিচিত্র আবেষ্টনীতে পড়ে নানা রকম মানুষ দেখেছি আমি। .....মানব জীবনের বৈচিত্র্যই সবচেয়ে বেশী ইন্‌সপায়ার করে। পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সাহিত্যে তারই বিচিত্র বিভিন্ন বলিষ্ঠ রূপ আঁকতে চেষ্টা করেছি আমি। উচ্চ-নীচ ধনী-দরিদ্র বিদ্বান-মূর্খ, পাপী-পুণ্যবান, সক্ষম-অক্ষম, সবাই আমার কাছে শিল্পসৃষ্টির উপকরণ মাত্র।"**

বনফুলের অভিজ্ঞতার এই বিশাল ব্যাপ্তি তাঁর গল্পে **'মহাকাব্যিক'** বিস্তার দিয়েছে।[৩১] জীবনকে দেখা এবং তাকে রূপ দেওয়ার মধ্যে এক অদ্ভুত সংযম লক্ষ্য করা যায় বনফুলের গল্পে। বনফুল তাঁর সুদীর্ঘ চিকিৎসক জীবনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন, মানুষের জীবনের কাছে এসে তার উত্তাপ গ্রহণ করেছেন এবং তারপর 'গোলকুঠি' বাড়ির চার দেয়ালে মধ্যে বসে রাতের পর রাত দার্শনিকের মত মানুষের বিচিত্র জীবন নিয়ে ভেবেছেন বৈজ্ঞানিকদের বস্তুনিষ্ঠা দিয়ে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করেছেন এবং সবার শেষে মানবিকবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্যিকের রসবোধ দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। নিজস্ব **'ঢঙে'** বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মানব জীবনের যে বিচিত্র চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন তা আমাদের বিস্মিত করে। কি আঙ্গিকে, কি ভাষাশৈলী নির্মাণে, কি রূপরীতিতে, কি জীবন দর্শন ব্যাখ্যায় তিনি সিদ্ধকাম পুরুষ। তাঁর গল্পগুলি জলের মতো একা একা আমাদের মনে, চিন্তায়, চেতনায় ঘুরে ঘুরে কথা বলে এবং শেষে এক বচনাতীতের অনুভতি নিয়ে আসে।

'কল্লোল' যুগের উদ্দামতা, উচ্ছৃলতা, লাগামছাড়া যৌনধর্মী উন্মাদনাপূর্ণ লেখা তিরিশের

দশকে থিতু হয়ে আসতে থাকে। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও তার পরবর্তীকালে অর্থাৎ চল্লিশের দশকের গল্পে তা খুব একটা দেখা যায় না। এসময় **'বাস্তুহারা আর বঞ্চিতের কান্না, গৃহহারা আর ধর্ষিতার কান্না'**[৩২] মানুষের জীবনসংগ্রাম, কালোবাজারি, মন্বন্তর, রেশনিং সমস্যা, ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা— সবকিছু মিলে বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, এমন কি শৈল্পিক জীবনেও চরম অবক্ষয় নিয়ে আসে। সমস্ত নৈতিক আদর্শের বিনষ্টি হয়, আত্ম সংগ্রাম, আত্ম সমীক্ষা, জীবন জিজ্ঞাসা, বেকার সমস্যা রূপ পেতে থাকে ছোটগল্পে। তবে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকের গল্পকারদের বিষয় এক হলেও বক্তব্য আলাদা। যেমন— রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' আর বিমল করের 'নিষাদ'; রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' আর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'একরাত্রি'-র বক্তব্য এক নয়। আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সাহিত্যিকেরা ইম্প্রেশনের বদলে এক্সপ্রেশনকে রূপ দিলেন তাঁদের গল্পে। বাইরের আপাত দৃশ্য রূপ নয়, মানুষের ভিতরের সত্যকে দেখাতে প্রয়াসী হলেন তাঁরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত সেই জীবন রূপায়ণ আরো নির্মম, অকুণ্ঠ ও নিরাসক্ত হয়ে উঠল। বিষাদ, বিচ্ছিন্নতাবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, সংশয়, হতাশা, আশা, আত্মবিরোধ ও আত্মানুসন্ধান প্রধান হয়ে উঠল। মানুষের জীবনের সেই সংঘর্ষ, নীচতা, ভণ্ডামি, চরিত্রহীনতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, আদর্শহীনতার নির্মম বিশ্লেষণ **'বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক'** বনফুল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের স্পর্শপাতে এমনভাবে রূপ দিলেন, যা আমাদের এক বিশেষ অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে যায়, এই আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার বিশেষ রূপ নির্মাণে বনফুল সত্যই বিশিষ্ট।

-ঃ উল্লেখপঞ্জী ঃ-

১। 'কালান্তর'— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পুনর্মুদ্রণচৈত্র ১৪০৩। পৃ.-৪১৫।

২। 'বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ'— বীরেন্দ্র দত্ত। প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ: ২০০৩ মার্চ -২০০৪ এপ্রিল। পৃ. - ৫২।

৩। ঐ

৪। 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত'— ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ - ১৯৯৫। পৃ.- ৫৪৯।

৫। ''বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার'— শ্রীভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ- ২০০৬-২০০৭, পৃ.- ২৪৬।

৬। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'— সুকুমার সেন। আনন্দ । পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে, ২০০২, পৃ.- ৩৪০।

৭। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'— শ্রী ভূদেব চৌধুরী, চতুর্থ পর্যায়, (রবীন্দ্র যুগ: দ্বিতীয় পর্ব)। দে'জ পাবলিশিং। দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ২০০৩, আষাঢ় ১৪১০। পৃ.- ২৫৭।

৮। ঐ।

৯। 'সাহিত্য সন্ধান'— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য বিহার। দ্বিতীয় সংস্করণ: মার্চ ১৯৮৮। পৃ.-২৬১।

১০। 'কল্লোল যুগ'— অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। দশম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪১৬। পৃ.-৩৩।

১১। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'— শ্রী ভূদেব চৌধুরী, চতুর্থ পর্যায়, (রবীন্দ্র যুগ: দ্বিতীয় পর্ব)। দে'জ পাবলিশিং। দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ২০০৩, আষাঢ় ১৪১০। পৃ.- ৩৭৪।

১২। 'বনফুলের ফুলবন'— ড. সুকুমার সেন। সাহিত্যলোক। প্রথম প্রকাশ: দোলপূর্ণিমা ১৩৯০। পৃ.- ১৭।

১৩। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'— শ্রী ভূদেব চৌধুরী, চতুর্থ পর্যায়, (রবীন্দ্র যুগ: দ্বিতীয় পর্ব)। দে'জ পাবলিশিং। দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ২০০৩, আষাঢ় ১৪১০। পৃ.- ২৬৯।

১৪। 'বাংলায় গল্প ও ছোট গল্প'— ড. সরোজমোহন মিত্র। তুলসী প্রকাশনী। প্রথম সংস্করণ: আগষ্ট ১৯৯৭, পৃ. - ২২২।

১৫। 'ছোটগল্পের কথা'—ভূদেব চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পরিমার্জিত তৃতীয় মুদ্রণ: জানুয়ারী ২০০০। পৃ.-৮৯।

১৬। 'বনফুলের ফুলবন'— ড. সুকুমার সেন। সাহিত্যলোক। প্রথম প্রকাশ: দোলপূর্ণিমা ১৩৯০। পৃ.- ১৮।

১৭। ঐ, পৃ.- ১৬।

১৮। 'লেখকের কথা'— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দ্বিতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭। 'সাহিত্য কড়ার আগে' প্রবন্ধ। পৃ. - ৩০।

১৯। ''বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার'— শ্রীভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ- ২০০৬-২০০৭, পৃ.- ৩৬৫।

২০।'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'— সুকুমার সেন। আনন্দ । পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে, ২০০২, পৃ.- ৩৫৩।

২১। 'বাংলা গল্প বিচিত্রা'— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশ ভবন। পঞ্চম মুদ্রণ: আশ্বিন ১৪১০। পৃ.– ৫১।

২২। 'কালের পুত্তলিকা'— অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং। তৃতীয় সংস্করণ: বৈশাখ ১৪১১, এপ্রিল ২০০৪। পৃ.– ৩৩৯।

২৩। 'ছোটগল্পের বিনির্মাণ'— তপোধীর ভট্টাচার্য। অঞ্জলি পাবলিশার্স। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ:জুলাই, ২০০৬। পৃ. ১৪।

২৪। 'লেখকের কথা'— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দ্বিতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭। 'সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ। পৃ. – ৮৫।

২৫। 'প্রবন্ধ সংকলন'— বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধ। দে'জ পাবলিশিং। ষষ্ঠ সংস্করণ: আগষ্ট ২০০৮। পৃ.–৭৩।

২৬। 'কল্লোল যুগ'— অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। দশম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪১৬। পৃ.–৮৪।

২৭। 'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য'—বুদ্ধদেব বসু। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। চতুর্থ মুদ্রণ: জানুয়ারী ১৯৮৩। পৃ.১২৫।

২৮। 'কল্লোল যুগ'— অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। দশম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪১৬। পৃ.–১৩৫।

২৯। 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য'— গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং। দ্বিতীয় সংস্করণ: আষাঢ় ১৪০৭/জুন২০০০। পৃ.– ৩১০।

৩০। ঐ, পৃ. – ৩১২।

৩১। 'কথাসূত্র'— পবিত্র সরকার। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১০। পৃ. – ১১৪।

৩২। 'বাংলা কথা সাহিত্য–জিজ্ঞাসা'— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০৪। পৃ. ১৩৪।